তারিখ ... 16 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংবাদ

শিক্ষার হার বাড়লেও মান নিয়ে সংশয়

ড. মিহির কুমার রায়

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন– রূপকল্প ২০২১ কে সামনে রেখে দেশের শিক্ষার হার শতভাগে উন্নতি করতে হবে। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল সুস্থ, সবল, চেতনা সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক, বৈষম্যহীন মানব সম্পদ সৃষ্টি, যা শুধু একটি পরিসুদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থাই দিতে পারে। দেশের সরকার প্রধানের উক্তি সাঁরা জাতিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিতে অনেক সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবেঁ যাঁরা বামপন্থি রাজনীতির সঙ্গে সংযুক্ত তারা প্রায়শই বলে থাকেন অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের মতো শিক্ষাও মানুষের মৌলিক অধিকার যা মনোবিকাশের পথ উন্মুক্ত করে এবং জীবনের সর্বস্তরের বিষয়াবলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, যেমন নৈতিকতা বোধ সৃষ্টিতে, জীবন জগৎকে জাগ্রত করতে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটাতে ইত্যাদি। একজন পণ্ডিত বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি সম্পদের মালিক হয় তবে তা রক্ষা করতে কেয়ারটেকার রাখার প্রয়োজন হয় যা ব্যয় বহুল, আর যদি জ্ঞানের অধিকারী হয় তবে সেই জ্ঞানই তাকে সদা সর্বদা পাহারা দিয়ে রাখবে যা অর্জিত হয় সুশিক্ষার মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতির অধ্যাপক টিডব্লিউ সুজ বলেছিলেন, অর্থনীতিতে যত ধরনের বিনিয়োগ রয়েছে তার মধ্যে শিক্ষা খাতের বিনিয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।

এই বিষয়গুলোকে অনুধাবন করেই ২০১০ সালে শিক্ষানীতি প্রণীত হয়েছিল, যা বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে সুধী মহলে আলোচিত। বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের ফলে সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বোর্ডগুলো যে চার স্তরের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করেছে তা আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হয়েছে, যা আমাদের শিক্ষার হার শতকরা ৭২ ভাগ বৃদ্ধির একটি প্রধান নিয়ামক। তাছাড়াও শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) অবদান বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত তৃণমূল পর্যায়ের জনবসতির জন্য গণশিক্ষা কিংবা কর্মমুখী কার্যক্রম আমাদের সার্বিক শিক্ষার হারে বিশেষ অবদান রয়েছে। অপরদিকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বিশেষত মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনের সুযোগ সৃষ্টি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সরকারি সহায়তার প্যাকেজ সৃষ্টি এবং উচ্চশিক্ষায় বিশেষত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ব্যাপক বিস্তৃতি আমাদের শিক্ষার হার বাড়ার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত।

শিক্ষামন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন যে, শিক্ষার হার আগের চেয়ে তুলনামূলক বিচারে অনেক বেড়েছে এখন শিক্ষার মানের ব্যাপারে জোর দেয়ার সময় এসেছে। বিশেষত একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ এর কথা বিবেচনায় রেখে। এরই মধ্যে উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নকালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন quot;Higher Education Quality Improvement Project (HEQEP) নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে কয়েক বছর যাবত যেখানে বাংলাদেশের ১৩৪টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করছে পর্যায়ক্রমে। তাছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ রুটিনমাফিক পরিচালিত হচ্ছে। তারপরও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার মান নিয়ে সব মহলে যে আলোচনা/সমালোচনা রয়েছে তা কোনভাবেই গোছানো সম্ভব হয়ে উঠছে না। অনেকেই বলেন বিভিন্ন পর্যায়ে ত্যাগী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকের স্বল্পতা চোখে পড়ার মতো এবং যারা আছে তাদের পক্ষে বিশাল এই প্রক্রিয়াকে সামাল দেয়া সম্ভব হয়ে উঠছে না এবং একটি প্রজন্ম ফাঁক (Generation Gap) সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ যারা অবসর গ্রহণ করে চলে গেছেন তারা ভালো, আবার যারা আসছেন তারা পূর্বেকারদের মতো ত্যাগী কিংবা জ্ঞানী নন। আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ফলে শিক্ষার্থীবৃন্দ লাইব্রেরি কিংবা বইমুখী না হয়ে ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে যাওয়ায় জ্ঞানচর্চার কাজে ব্রেক নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে যার বেশিরভাগই নেতিবাচক বলে বিবেচিত। অথচ বিশ্বায়নের যুগে এর প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না যাতে সরকার তৃণমূল থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বাজেট কাঠামোর আওতায় সহায়তা দিয়ে চলছে। তারপরও শিক্ষার মান বেড়েছে তা বাস্তবে প্রতিফলন পরিলক্ষিত নয়। ধরা যাক সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিভিন্ন ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা চলছে তাতে ফলাফলে কোনভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত কোঠা পূরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক ইউনিটে ১৩.৫৫%, খ ইউনিটে ১১.৪৩%, গ ইউনিটে ৫.৫২% এবং ঘ ইউনিটে ৯.৮৩% ভর্তি পরীক্ষায় পাস করেছে। এতে একদিকে যেমন প্রতিষ্ঠান বিপাকে অন্যদিক শিক্ষার্থীসহ অভিভাবক বিপাকে যদিও উচ্চ মাধ্যমিক জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কোঠার চেয়ে অনেক বেশি। এই তো গেল ভর্তি যুদ্ধের বীরত্বগাঁথা কাহিনী। এখন আসা যাক যারা উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত তাদের ভাবনাটা হলো ক্লাসে জ্ঞান দানের ঘাটতি প্রকট অর্থাৎ শিক্ষক যা পড়াচ্ছেন তা শিক্ষার্থীর চাহিদার কাছাকাছি যেতে পারছে না বিধায় এই বিশাল ঘাটতি নিয়ে যখন তারা শিক্ষা জীবনের শেষ প্রান্তে উন্নীত হয় তখন একটি অনুশোচনা (Realization) প্রায়শই পেয়ে বসছে যা হলে কি লিখলাম? কতটুকু শিখলাম? এই পরিমাপ শিক্ষার জ্ঞান নিয়ে এখন কোথায় যাব? তারপর অভিভাবক পর্যায়ে যখন শিক্ষার্থী সন্তানকে প্রশ্ন করা হয় এখন কি করবি– আর উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, চাকরি না স্বাধীন উদ্যোক্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ? তখন মনে হয় পৃথিবীর সব ভাষা ম্লান হয়ে যায়। এটি সমসাময়িক কালে অভিভাবকদের অনুভূতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতি। এই অবস্থা একদিনে তৈরি হয়নি এবং এর সমাধান একদিনে সম্ভব নয়। কালের আবর্তে বিষয়টি ঘটেছে এবং সামনের দিকে আরও ঘটবে।

এখানে উল্লেখ্য, দেশের নামিদামি স্কুল ও কলেজগুলোর যেগুলোর ঐতিহ্যগতভাবে অবস্থান মফস্বলে, বোর্ড পরিচালিত পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল মেধার ক্রমানুসারে তারা দেশের নির্দিষ্ট স্থানটি অনেক আগেই হারিয়ে বসে আছে এবং এই স্থানটি দখল করে নিয়েছে নব উদীয়মান শহরকেন্দ্রিক কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এইটি সামাজিক বৈষম্যের আরও একটি রূপ যদিও পত্রপত্রিকায় দেখা যায় অজো পাড়া-গাঁয়ের স্কুল-কলেজ থেকে দিনমজুরের সন্ধানটি জিপিএ-৫ পেয়েও আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে মেডিকেল কিংবা প্রকৌশলে কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়েও পড়তে অক্ষম হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কিভাবে হতে পারে তা নিয়ে তেমন লেখালেখি চোখে পড়ে না। তবে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও গবেষণা সংস্থা এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। শিক্ষা প্রশাসকরাও জানেন এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকতে হলে শিক্ষিতের হার উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার মানের দিকেও নজর দিতে হবে কিন্তু কিভাবে? সরকারি কাঠামোর দিকে তাকালে দেখা যায় যে প্রতিটি স্কুল-কলেজে সৃষ্ট পদের তুলনায় শিক্ষকের পদ অনেক শূন্য রয়েছে এবং যারা কর্মরত তাদের অনেকেই কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে তাদের শিক্ষকতার চাকরিটি পরিচালনা করেন না আর কি মানের শিক্ষা উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীকে দিচ্ছে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ক্লাস নিচ্ছেন কি-না সে কথা নাই বললাম। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে অনেক সরকারি স্কুল-কলেজ রয়েছে যেখানে এ ঘটনাগুলো বেশি ঘটছে যা দিক ভালো করার কেউ আছে বলে মনে হয় না আপতদৃষ্টিতে। আসা যাক সরকারি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের কিংবা বিভাগীয় পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যেখানে প্রায়ই দেখা যায় একই সঙ্গে তারা সমান্তরালভাবে চাকরি পরিচালনা করে কখনও বা ডেপার্টশনে বা প্রশাসনের দৃষ্টির অন্তরালে। জনৈক কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ঢাকায় পরিবারের সঙ্গে থাকে এবং সপ্তাহের তিন দিন যখন ক্লাস থাকে তখনই উপস্থিত হয় যা প্রশাসনিকভাবে পরিবীক্ষণ (Monitoring) করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কেউ নেই। এ ধরনের একটি পরিবেশে সরকার প্রতিটি বৃহত্তর জেলায় একটি করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে কিন্তু প্রশ্নটি হলো সরকার শিক্ষক কোথায় পাবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মসূচি পরিচালনার জন্য যেখানে শিক্ষক নিয়োগ হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়, মেধার মানদণ্ডে নয়। অতিমাত্রায় রাজনীতির উপস্থিতি মেধার লালন ও পালনকে তাড়িয়ে বেড়ায় প্রতিনিয়ত, যা সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী কাজের পথে অন্তরায়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি কাজ শিক্ষা (teaching), গবেষণা (Research) ও সম্প্রসারণ (Extension)। কোন আমলে পাঠ্যসূচি (Syllabus) তৈরি হয়েছে যার কোন আধুনিকায়ন (Modernization) নাই বললেই চলে অথচ বিশাল জমি, দালান, হোস্টেল ও অন্যান্য অবকাঠামো নিয়ে এসব প্রতিষ্ঠানগুলো কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আসা যায় দেশের বর্তমানে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থার দিকে যাদের বেশিরভাগেরই কোন নিজস্ব ক্যাম্পাস নেই, নিচতলায় হোটেল উপরের তালায় বিশ্ববিদ্যালয়। এক অপূর্ব মিশ্রণের সমাহার নিয়ে শিক্ষা বাণিজ্য বর্তমানে জমজমাট। আর মানসম্মত শিক্ষা মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপের বেড়াজালে আবদ্ধ।

সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ভার্সিটির একজন শিক্ষক আমাকে জানালেন শিক্ষকরা ছাত্রদের বেড়াজালে আবদ্ধ কিংবা জিম্মি হয়ে গেছে বিশেষত গ্রেড প্রদানের ক্ষেত্রে যা শিক্ষা পদ্ধতির এক অস্বস্তিকর রূপ। এখন একজন শিক্ষক কেনই বা ছাত্রের কাছে জিম্মি হবে? নিশ্চয়ই শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব কিংবা নৈতিকতায় ঘাটতি রয়েছে যে সুযোগটি ছাত্ররা নিয়ে তার ফলাফলের ভাণ্ডার পূরণ করবে যা নিয়ে সে কোথায় যাবে এই চিন্তা কি ছাত্ররা একবার করেছে? এ বিষয়টি ছাত্রদের ওপর ছেড়ে না দিয়ে শিক্ষক কেন তার নৈতিক দায়িত্বটুকু পালন করছে না? এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেখা যাবে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় নিশ্চয়ই কোন গলদ রয়েছে যা কেবল মুখচেনা কিংবা সুপারিশ কিংবা আত্মীয়কেই বাছাই করা হয় যাদের মেধা, ব্যক্তিত্ব কিংবা কোনটিই বিবেচনায় আনা হয় না। এ অবস্থার জন্য দায়ী শুধু কোন সুনির্দিষ্ট সার্ভিস রুল না থাকা যদিও ইউজিসি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এ বিষয়গুলোর উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তদারকি না থাকায় এই আইন আর কার্যকর হয়ে উঠছে না। মালিকরা মনে করছে যে বিনিয়োগ করা হয়েছে তার একটা সফল আদায় তথা মুনাফা অপরিহার্য কিন্তু সেই মুনাফার যে একটা বড় অংশ বিশ্বদ্যিালয়ের একাডেমিক উন্নয়নে ব্যয়িত হবে তার কোন সামাজিক উদ্যোগ এখানে পরিলক্ষিত হয় না অথচ সুযোগ রয়েছে। তাই আগামী দিনের শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণ নিয়ে যে সম্ভাবনা রয়েছে তা করার জন্য প্রয়োজন প্রথমত সুশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষার উপযোগী করে তাকে তৈরিকরণ সেটা যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক না কেন? একজন ভালো শিক্ষক ছাড়া ভালো ছাত্র তৈরি হয় না যা চিরন্তন সত্য কথা এবং এটি তৈরি করার দায়িত্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের। এ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অবারিত সুযোগ থাকলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তেমন কিছুই নেই, যা মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠায় বড় অন্তরায়।

আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সব সুযোগ গ্রহণ করে তাদের career তৈরি করে সত্যি কিন্তু তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজে লাগায় না। আর গবেষণার ক্ষেত্রটি (এমফিল, পিএইচডি ছাত্র গাইড) একেবারেই ক্ষীণ হয়ে গেছে অথচ এর জন্য অবকাঠামোগত সুবিধার যেমন সুবিশাল লাইব্রেরি, কম্পিউটার ল্যাব, হোস্টেল, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি কোন ঘাটতি নেই। এ জায়গাগুলোতে শিক্ষক নিজে থেকে যদি দায়িত্ব পালনে অপারগ হয় তা কিছু করার থাকে না। কিন্তু প্রশাসনিক কিছু compulsion থাকলে শিক্ষকরা তা করতে বাধ্য যেমন পদোন্নতির ক্ষেত্রে গবেষণা ছাত্র তত্ত্বাবধানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া যা বর্তমানে অনুপস্থিত অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এগুলো শত ভাগ পালন করা হয়। আবার শিক্ষক পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্কুল-কলেজ পর্যায়ের নিয়মের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্নতা থাকলেও একটি Performance Appraisal এর নিয়ম রয়েছে। কিন্তু সেগুলো কতটুকু কার্যকর তানিয়ে প্রশ্ন আছে বিভিন্ন মহলে; দ্বিতীয়ত: শিক্ষা কোন পণ্য নয়- সেটা একটি সেবা খাত। এই ধারণাটি পোষণ করে সেভাবে এগুতে হবে। কিন্তু বাজার অর্থনীতির কারণে তা আর হয়ে উঠছে না। শিক্ষা যদি হয় জাতির মেরুদণ্ড তাহলে এর ভিত শক্ত করার ব্যাপারে সরকার, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর সমান ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষকদের বলা হয় শিক্ষার কারিগর যাদের স্বার্থ রক্ষায় সরকার বদ্ধপরিকর কিন্তু উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে যে প্রশ্নটি বারবার আলোচনায় আসে সেখানে শিক্ষকদের অবহেলাকেই বেশি করে দেখা হয় বিষেশত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। তাই উচ্চশিক্ষা ফলাফল নির্ভর না হয়ে জ্ঞাননির্ভর হোক এবং বাংলাদেশ বিনির্মাণে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতা নিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে সেই প্রত্যাশা রইল; তৃতীয়ত: সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোর ব্যাপারে যে শিক্ষকরা ক্লাসে মনোযোগী নয় এবং শিক্ষার্থীরা কোন প্রশ্ন করলেও তার উত্তর যে পাওয়া যায় না যা সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার একটি দুর্বল দিক যা একটি শক্ত ভিত তৈরি করেছে। ফলে এই অবস্থায় শিক্ষার্থীরা তাঁদের গ্যাপ পূরণের জন্য ক্লাসের পাশাপাশি কোচিং সেন্টারে কিংবা গৃহশিক্ষকের শরণাপন্ন হয় যা অভিভাবকদের জন্য বাড়তি বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শিক্ষা ব্যবস্থাকে শ্রেণী কক্ষমুখী হতে হবে যাতে সব প্রশ্নের সমাধান এখানে নিষ্পত্তি হয়ে যায়; সব শেষে বলা যায়, শিক্ষাই হোক জাতির মেরুদণ্ড যার ওপর ভিত্তি করে সারা জাতি দাঁড়াবে মাথা উঁচু করে।

[লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ, গবেষক ও ডিন, সিটি ইউনিভার্সিটি ও জাস্ট সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি, ঢাকা]